সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৬ ॥ সংখ্যা : ১ ॥ কার্তিক ১৪২৬ ॥ অক্টোবর ২০১৮

https://doi.org/10.62328/sp.v56i1.3

বাঙালি মুসলমানের পরিচয়ের রাজনীতি : মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের তৎপরতার পর্যালোচনা

মোহাম্মদ আজম*

সারসংক্ষেপ :

বিশ শতকের ষাটের দশকের কৃতী ব্যক্তি হিসাবে মুহম্মদ আবদুল হাই বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর রচনাবলিতে এর পরিচয় আছে। পরবর্তীকালে তাঁকে নিয়ে যাঁরা আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন, তাঁরাও আবদুল হাইয়ের ভূমিকার যথোচিত স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী বয়ানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে গিয়ে ভাষ্যকারেরা অনেকসময় মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের রচনার আংশিক ভাষ্য তৈরি করেছেন। তাঁর 'বাঙালি' এবং 'মুসলমান' পরিচয়ের মধ্যে বিরোধ তৈরি করেছেন। এ লেখায় টেক্সট হিসাবে মূল রচনা ও ভাষ্যকে সমান্তরালে রেখে দেখানো হয়েছে, অধিকাংশ ভাষ্যে এ বিষয়ে যেরকম দাবি করা হয়েছে, আবদুল হাই রচনাবলিতে আসলে সেরকম কিছু নাই। তাঁর রচনা ও অন্য তৎপরতায় 'মুসলমান' ও 'বাঙালি' পরিচয় একসাথে অবস্থান করে, এবং প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে। মুহম্মদ আবদুল হাই আমাদের আশ্বস্ত করেন, পরিচয়জ্ঞাপক উপাদানগুলো বিরোধমূলক না হয়ে সহাবস্থানমূলক হতে পারে, এবং প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পটভূমিতে মুহম্মদ আবদুল হাই সবচেয়ে কৃতী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের একজন। আমাদের মূলধারার জাতীয়তাবাদী আখ্যানে সাংস্কৃতিক তৎপরতা ও সংস্কৃতির ময়দানে সংঘটিত প্রতিরোধ-লড়াইয়ের প্রাধান্য আছে। সামরিক শাসনের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক কর্মসূচির তুলনামূলক ঘাটতির কালে এটাই হয়ত স্বাভাবিক ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত অপরাপর প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কেন্দ্রে অবস্থান করায় মুহম্মদ আবদুল হাই স্বভাবতই 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ওই বিশেষ মুহূর্তগুলোতে খুব দায়িত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিলেন। তথ্য-উপাত্ত যথেষ্ট নির্ভরযোগ্যভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে, তিনি বেশ সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, এবং হয়ে উঠেছিলেন যুগপৎ সক্রিয়তা ও নির্ভরতার প্রতীক।

---

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পরবর্তীকালে রচিত আবদুল হাই সম্পর্কিত বিবরণীগুলো মোটামুটি সন্তোষজনকভাবে তাঁর সেই কৃতিত্ব ও মর্যাদার মূল্যায়ন করেছে। মুশকিল হল, বাংলাদেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রভাবশালী বয়ানগুলোর প্রায় সাধারণ বৈশিষ্ট্য মান্য করেই মুহম্মদ আবদুল হাইকে নিয়ে লেখা বিবরণীগুলোও সাতচল্লিশের আগের পাকিস্তান আন্দোলন, পাকিস্তান রাষ্ট্র ও এর সাংস্কৃতিক-মতাদর্শিক ভিত্তি, মুসলমান-পরিচয়, ইসলামি ভাবাদর্শ ইত্যাদির সাথে ওই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটা বৈপরীত্য খাড়া করে। অথচ মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সাহিত্যকর্ম ও তৎপরতার অতি-মনোযোগী পাঠেও এ ধরনের কোনো বৈপরীত্য চোখে পড়ে না। এ লেখায় আমরা দেখাতে চাইব, ষাটের দশকের বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্য অনেক শরিকের মতো মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ক্ষেত্রেও এ উপাদানগুলো একসাথে অবস্থান করত। সময়ের প্রয়োজনে তার কোনো কোনোটি জোরদার হয়ে উঠলেও বাকিগুলো গায়েব হয়ে যায় নাই। তার মানেই হল, প্রভাবশালী বাঙালি জাতীয়তাবাদী বয়ানে পরবর্তীকালে এগুলোকে যেরকম পরস্পর-বিরোধী উপাদান হিসাবে দেখানো হয়েছে, তা মোটেই ইতিহাস ও বাস্তবসম্মত নয়; বরং এগুলো-যে একত্রে অবস্থান করতে পারে, সে সাক্ষ্য-প্রমাণই দেদার পাওয়া যায়।

১

মুহম্মদ এনামুল হক (২০০০ : ৭৭) জানাচ্ছেন, মৃত্যুর পরই কেবল তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন ঢাকার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে মুহম্মদ আবদুল হাই কী গভীর ও প্রয়োজনীয় সম্মানজনক আসন লাভ করেছিলেন। কিভাবে তৈরি হল সে প্রতিষ্ঠা, যা এনামুল হক একই কাজের কারবারি হয়েও আগে বুঝতে পারেননি? তাঁর ভাষায় : 'নজরুল জন্মতিথিতে, রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে, ইকবাল দিবসে, নববর্ষ-উদ্‌যাপনে, বিবিধ বিচিত্রানুষ্ঠানে, সঙ্গীতের জলসায়, নৃত্যের আসরে, নাটকের উদ্বোধনে যার সুস্থ কণ্ঠস্বর শুনে মন খুশীতে ভরে উঠত, কে জানতো তা এমন করে হঠাৎ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে?'

হ্যাঁ, মুহম্মদ আবদুল হাই ছিলেন অবিকশিত নগর ঢাকার আধুনিকায়নের এক অবলম্বন; সে আধুনিকায়নের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসাবে সাংস্কৃতিক চর্চার যে উপাদানগুলো ঢাকায় তখন খুব জোরালোভাবে চর্চিত হচ্ছিল, বা অন্তত চর্চার প্রয়োজনের কথা বিভিন্ন পক্ষ অনুধাবন করেছিল, তিনি সে চর্চার মাননির্দেশক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী হিসাবে ওই চর্চার রেফারেন্স পয়েন্ট তো ছিল কলকাতা। আবদুল হাইয়ের পক্ষে সে ধরনের রেফারেন্স হয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে তাঁর জন্ম, পড়াশোনা, কৃষ্ণনগরে বসতি এবং ভাষা ও সাহিত্যচর্চার পথ ধরে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাথে

তখনকার প্রায় যে কোনো ধরনের সংযুক্তিই জাতীয়তাবাদী বয়ানে প্রতীকী তাৎপর্য অর্জন করেছিল। আর মুহম্মদ আবদুল হাই তো এ ক্ষেত্রে প্রায় অনন্য অবস্থানে ছিলেন। একদিকে 'তিনিই প্রথম বাঙালি মুসলমান ছাত্র, যিনি বাঙলায় বিএ (অনার্স) ও এমএতে প্রথম শ্রেণী লাভ করেন', অন্যদিকে 'তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, সুতরাং বাঙলাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের, বাঙলা বিভাগের নতুন কালের স্থপতি' (হুমায়ুন ১৯৯৪ : পাঁচ-ছয়)। তদুপরি, মার্জিত ব্যক্তিত্ব আর আকর্ষণীয় বচন তাঁকে সন্দেহাতীতভাবে বাড়তি গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছিল। নীলিমা ইব্রাহিম (২০০০ : ৯১) জানাচ্ছেন, 'হাই সাহেব ভাগীরথী তীরের কথা বলতেন। দীর্ঘকাল ঢাকা বাসেও তাঁর বাচনভঙ্গীতে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।' মোহাম্মদ আবু জাফর (২০০০ : ৪১৫) লিখেছেন, 'পরবর্তীকালে বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার সময় উচ্চারণরীতির দিক থেকে তাঁর বাচনভঙ্গি প্রায় অত্যুচ্চ শুদ্ধিতে পৌঁছে গিয়েছিল।... ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর শান্ত অথচ দৃঢ় ভাবটি এবং সে সঙ্গে তাঁর বাচনভঙ্গিটি একাত্ম হয়ে তাঁকে এমনই একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছিল যে, অতি বড় ডানপিটে ছাত্রও তাঁর সামনে গিয়ে মিইয়ে পড়তো।' এ ধরনের উচ্চারণের প্রতি ঢাকার মোহাবেশ সাংস্কৃতিক রাজনীতির চলমান প্রবাহে যে স্থায়ী অধস্তনতা তৈরি করছিল, সেটা অবশ্য ভিন্ন বিবেচনা। কিন্তু আবদুল হাই নিঃসন্দেহে সে মোহাবেশের সুবিধা পেয়েছিলেন।

এর সাথে যুক্ত হয়েছে অন্য এক জরুরি উপাদান – পশ্চিমে পড়াশোনা। বিলাতে আবদুল হাই পড়েছিলেন ভাষাবিজ্ঞান; এবং যে-সে ভাষাতত্ত্ব নয়, 'আধুনিক' ভাষাবিজ্ঞান। এ কথা যে বারবার উচ্চারিত হয়েছে, তার একাডেমিক তাৎপর্যের বাইরে অন্য গভীর তাৎপর্য আছে। নতুন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা তখন কাছা খুলে 'আধুনিক' হওয়ার জন্য মত্ত। এ কথা এমনকি পাকিস্তানবাদী, ইসলামপন্থি এবং 'প্রতিক্রিয়াশীল'দের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। আধুনিকতার অভিযাত্রার সাথে ধর্মবাদীদের যে কোনো বিরোধ নাই, তা কলকাতার উনিশ-বিশ শতকের ইতিহাসে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাসহ অসংখ্য ঘটনায় বারবার প্রমাণিত হয়েছে; আর ইউরোপীয় আধুনিকতার তত্ত্বে ও ইতিহাসে সে সাক্ষ্যই পাই। পঞ্চাশ-ষাটের দশকের ঢাকায় আধুনিকায়নে উন্মুখ নানা পক্ষের বিপুল মানুষের কাছে মুহম্মদ আবদুল হাই যে হয়ে উঠেছিলেন অন্যতম প্রধান স্তম্ভ, তার পেছনে দুবছরের বিলাতবাসের অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ইতিবাচক উপাদান হিসাবে কাজ করেছিল।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক একাডেমিক তৎপরতা। কিন্তু মুহম্মদ এনামুল হক (২০০০ : ৭৮) ঠিকই শনাক্ত করেছিলেন, লোকে হাই সাহেবকে মুখ্যত পণ্ডিত হিসাবে সম্মান করলেও সংস্কৃতি ও সুরুচির একটা বাড়তি মহিমা তাঁর

ছিল, যা শুধু 'পাণ্ডিত্য' অভিধার গণ্ডিতে ধরা পড়ে না। তিনি যে গভীরভাবে রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন সেটাও, এনামুল হকের মতে, 'সংস্কৃতি-চেতনার একটা বড় লক্ষণ'। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনকারীর জন্য 'রবীন্দ্রানুরাগী' হওয়াটা মোটেই কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। কিন্তু ষাটের দশকের সেই চাপা ক্ষোভের সময়ে অনুল্লেখ্যই উল্লেখ্য হয়ে উঠেছিল; 'স্বাভাবিক' সাংস্কৃতিক তৎপরতা রূপান্তরিত হয়েছিল রাজনৈতিক তৎপরতায়। পরিস্থিতির চাপে মুহম্মদ আবদুল হাই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সক্রিয়তা ছাড়াই হয়ে উঠেছিলেন সাংস্কৃতিক রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্র।

২

আরো কোনো কোনো দিক থেকে তিনি সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শে যাঁদের বিশেষ আপত্তি ছিল না, অথচ চর্চা করতেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে, তাঁরা ওই বিশেষ রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এক অন্য ধরনের সুবিধা পেয়েছিলেন। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ বোধ করি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। মুহম্মদ আবদুল হাইও ওই অবস্থানে ছিলেন।

বাংলাদেশ যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে আলাদা হয়েছিল, এবং তা বিশেষভাবে ছিল পূর্ব বাংলা, আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্যে আলাদা, আর বিশেষভাবে আলাদা পশ্চিমবঙ্গ থেকে, সে বাস্তবতা বিশুদ্ধ রাজনৈতিক। এই রাজনৈতিক বাস্তবতা মুহম্মদ আবদুল হাই এবং তাঁর সমসাময়িক-পরবর্তী অনেকের জন্য অন্তত একাডেমিক-বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে প্রতিবন্ধক গণ্য তো হয়ই নি, বরং ব্যাপারটা যুগপৎ প্ররোচনা ও অনুপ্রেরণার মতো কাজ করেছিল। ওই সময়ের বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তির সন্দর্ভ, গবেষণার ধরন, বিষয় নির্ধারণ ও রচনার আভ্যন্তর স্বর পর্যালোচনা করলে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে আবদুল হাই এদিক থেকে বিশেষ সুবিধা পেয়েছিলেন। কারণ, বাঙালির পশ্চিমাংশ তার আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের মূল্যবান অংশটা হাসিল করেছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মানসম্পন্ন চর্চার দৌলতে। ফলে পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার পক্ষ থেকে বরাবরই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার অনুকূল পরিবেশ রক্ষা এবং বরাদ্দের দাবি জোরদার ছিল। অন্যদিকে আবার ভাষা ও সাহিত্যের চর্চাই পূর্ব বাংলার সাথে পশ্চিম বাংলার সম্পর্কসূত্র রক্ষারও প্রধান ক্ষেত্র। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের লেখালেখিতে এ দুই বিপরীত ঝোঁক সাদা চোখেই পড়া যায়।

তাঁর অকালপ্রয়াণে সৈয়দ মুজতবা আলী (২০০০ : ৭০-৭৫) যে শোকগাথা রচনা করেছিলেন, তাতে তিনি স্পষ্টতই পশ্চিম বাংলার অধিবাসী হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন। এ লেখায় মুজতবা আলী আবদুল হাইয়ের কৃতি ও কৃতিত্বের উল্লেখ

করেছেন; তারচেয়ে বেশি স্মরণ করেছেন উৎসাহদাতা হিসাবে আবদুল হাইয়ের বিশেষ অবদান। এটা হয়ত প্রতীকী, মুজতবা আলী এ লেখায় হরেন্দ্রচন্দ্র পালের নাম নিয়েছেন, এবং *বাংলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ* নামের যে অভিধান হরেন্দ্র পাল সম্পাদনা করেছিলেন, তার প্রকাশনায় মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সহযোগিতার কথা স্মরণ করেছেন। এ বইয়ের ব্যাপারে হয়ত পূর্ব বাংলারই বেশি আগ্রহ থাকার কথা; সে আগ্রহের প্রকাশ-স্বরূপ আবদুল হাই-যে রচনাটি প্রথমে *সাহিত্য পত্রিকায়* প্রকাশ করেছেন, আর পরে পুস্তকাকারে ছেপে বের করেছিলেন খোদ বাংলা বিভাগের তরফে, সেটিও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার দিক থেকে অনুমেয়ই ছিল। কিন্তু মুজতবা আলী এ ঘটনার প্রশংসা করেছেন কেবল হরেন্দ্রচন্দ্র পালের একটি গবেষণার গতি হল বলে নয়, বরং এর মধ্য দিয়ে দুই বাংলার জন্য জরুরি একটা কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে। বলার কথাটা এই, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে মুহম্মদ আবদুল হাই এমন এক সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন যেখান থেকে তিনি একই সাথে সেকালের স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনার পক্ষে যেমন কাজ করতে পেরেছিলেন, তেমনি সমন্বয়বাদী চিন্তারও সহায়ক হয়েছিলেন।

বাংলা বিভাগ আয়োজিত 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ, ১৩৭০'-এর উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন, এখন আর জ্ঞান-সাধনা দেশকালের সমস্যা-নিরপেক্ষ নয়। এদিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষত বাংলা বিভাগের বিশেষ দায়িত্ব আছে, তাঁর ভাষায়, 'দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য, আত্মিক বিশ্বাস এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার রক্ষণাবেক্ষণ, তার বিকাশ ও রূপায়ণে সহায়তা করাও বিভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য।' (উদ্ধৃত, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ২০০০ : ১৬)

মুহম্মদ আবদুল হাইকে যাঁরা চিনতেন তাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছেন, আর তাঁর রচনাবলির সাথে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাও মানবেন, তাঁর কাজের ধরন এবং প্রতিভার স্ফূর্তি রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বুদ্ধিজীবিতায় নয়, বরং একাডেমিক অনুশীলনে। কিন্তু ষাটের দশকের সেই চাপা আক্রোশের কালে ক্ষোভ যখন চাপা পড়া আগুন থেকে প্রায়শই প্রকাশ্য হয়ে উঠছিল, তখনকার বিপ্রতীপ টানে তাঁর তৎপরতার ক্ষেত্রও প্রসারিত হতে থাকে। ভিন্ন ভাষায় বলা যায়, অন্য সময়ে তাঁর যেসব কাজ বিশুদ্ধ একাডেমিক গণ্য হতে পারত, সময়ের প্রচ- প্ররোচনায় সে কাজগুলোই আবির্ভূত হয়েছে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক তৎপরতা হিসাবে।

৩

তিনি কাজও করেছিলেন প্রচুর। ১৯৫৪ সালের ১৬ নভেম্বর বিভাগীয় প্রধান হিসাবে তিনি যখন নিয়োগ পান, তখন তাঁর বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর কয়েক মাস। সাঈদ-উর

রহমান (২০০০ : ২৪৩) ঠিকই লিখেছেন, 'নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্বটি ছিল মর্যাদাসম্পন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ।' ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত বলছে, তিনি এই মর্যাদা সমুন্নত রেখে ঝুঁকি মোকাবেলা করে দায়িত্ব পালন করতে পেরেছেন। শিক্ষক হিসাবে শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে একটা উল্লেখযোগ্য আদর্শ স্থাপন করতে পেরেছিলেন তিনি। একাডেমিক পরিসরে নিজে চর্চা করেছেন ভাষাবিজ্ঞান। 'তিনি বাঙলাদেশে আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানের – বা ভাষাবিজ্ঞানের – জনক' (হুমায়ুন ১৯৯৪ : পাঁচ); আর অন্তত বাংলাদেশে এক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত অনতিক্রম্যই থেকে গেছেন। ভাষ্যকারেরা তাঁর নিজের গবেষণা বিশেষত ভাষা-বিষয়ক লেখালেখিকে যেমন কৃতিত্বপূর্ণ বলেছেন, সেরকম বা তারচেয়েও বেশি কৃতিত্ব দেখেছেন গবেষণায় উৎসাহদান এবং গবেষণার প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি তৈরিতে তাঁর সাফল্যে। এর মধ্যে ছিল এমএ ও পিএইচ ডি পর্যায়ের গবেষণার বন্দোবস্ত করা, আগ্রহী ও যোগ্যদের জন্য বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের উদ্যোগে সহায়তাদান, এবং মানসম্মত একাডেমিক প্রকাশনার উদ্যোগগ্রহণ। এই শেষোক্তটির তালিকায় বইপুস্তকের একটা লম্বা ফর্দ পাওয়া যাবে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল নিঃসন্দেহে *সাহিত্য পত্রিকার* প্রকাশ। বিশ্লেষকদের সকলেই এ বিষয়ে একমত, মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সম্পাদনায় *সাহিত্য পত্রিকা* এ অঞ্চলের গবেষণা পত্রিকার একটা উঁচু মান স্থাপন করেছিল, যার তুল্য কিছু এখানে আগে ছিল না। শুধু তাই নয়। অন্তত ভাষা ও সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে পত্রিকাটি পুরো বাংলাভাষী অঞ্চলেই যে অতুলনীয় ছিল, ভাষ্যকারদের প্রত্যেকেই তারও উল্লেখ করেছেন। সেকালের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে নিশ্চিন্তে বলা যায়, এ দাবি যথার্থ।

একটি উঁচু মাপের গবেষণা-পত্রিকার সম্পাদনা শুধু ব্যক্তিগত ঝোঁকের পরিচয় বহন করে না, রুচি ও সক্ষমতারও নিঃসংশয় প্রমাণ দাখিল করে। কালান্তরে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের প্রশংসার জন্য তাঁর নিজের গবেষণা এবং গবেষণা-পরিমণ্ডল তৈরির সাফল্যই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, যেমন বলেছেন অন্য সকলেও, ষাটের দশকের বাংলাদেশের আলাপ এটুকুতে সীমিত থাকতে পারে না। বিশেষত আবদুল হাই প্রসঙ্গে, যিনি 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদের বিশেষ ধরনের বিকাশ ও চর্চার ওই স্পর্শকাতর বছরগুলোতে অধিষ্ঠিত ছিলেন বাংলা বিভাগের প্রধান হিসাবে। তিনি নিজে যতটা সক্রিয় ছিলেন, তারচেয়ে অনেক বেশি সক্রিয়তা আদায় করে নিয়েছিল পাকিস্তানের অগণতান্ত্রিক জালিম শাসকগোষ্ঠী। তাদের উসকে দেয়ার জন্য বাঙালি প্ররোচক-গোষ্ঠীরও অভাব ছিল না। ফলে অল্প কয়েক বছর সময় পরিসরেই অনেকগুলো ইস্যুর মোকাবেলা করতে হয়েছিল তাঁকে। মুহম্মদ এনামুল হকের (২০০০ : ৮১) উল্লেখ মোতাবেক, 'যে সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা তাঁর মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে তার মধ্যে ভাষা আন্দোলন, ভাষা-সংস্কার প্রস্তাব, বাংলার পরিবর্তে আরবী-হরফ প্রবর্তন প্রস্তাব, বাংলা

ভাষার রোমানায়ন (রোমানাইজেশন) প্রস্তাব, অনার্স ও এম. এ. শ্রেণীর পাঠ-তালিকা পরিবর্তন প্রস্তাব, বাংলা বর্ণমালা সংস্কার প্রস্তাব প্রভৃতিই প্রধান।' তিনি আরো লিখেছেন, 'এ সমস্ত বিপদে তাঁকে দেখেছি ধীর, স্থির ও শান্ত।'

৪

মুশকিল হল, যাঁরা পরবর্তীকালে বিশেষত স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আবদুল হাইয়ের তরফে তাঁর এসব কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি দিয়েছেন, তাঁরা এতটা 'ধীরতা-স্থিরতা'র পরিচয় দিতে পারেননি। জাতীয়তাবাদী জোশ আর বয়ানের কাঠামো তাঁদের বিবরণীকে কোথাও কোথাও এমনকি অন্যায্যভাবে প্রভাবিত করেছে। এখানে এরকম দুটি উদাহরণ চয়ন করা যাক।

সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় (২০০০ : ১০১) লিখেছেন : 'রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী বহু কুটিলমনা বুদ্ধিজীবী যখন আপন আপন বিবেক বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে তৎকালীন সরকারের বিশেষ উদ্দেশ্যের পরিপোষকতা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ এক ধরণের রূপান্তর সাধনের জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছিলেন তখন মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর সমমনা ব্যক্তিদের সঙ্গে বিবেকী প্রতিবাদী কণ্ঠ তুলে ধরেছিলেন।'

মনসুর মুসার (২০০০ : ২০৭) ভাষ্যে আবদুল হাইয়ের সমধর্মী কৃতিত্ব বিবৃত হয়েছে এভাবে : 'আবদুল হাইর সবচেয়ে বড় সামাজিক দায়িত্ব ছিল ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে তৎকালীন যুগের ভাষা রাজনীতির মুখোশ উন্মোচন করা। অত্যন্ত সার্থকভাবে তিনি তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে পাকিস্তানী ভাষানীতির আভ্যন্তরীণ অগণতান্ত্রিক ইচ্ছাকে উলঙ্গ করে পথের মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছিলেন।... যখন তাঁর একাডেমিক যুক্তি পরাজিত হচ্ছিল রাজনৈতিক চাপের কাছে, তখন উপায়ন্তর না দেখে সহকর্মীদের নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন। রাজনীতি যেখানে অন্ধ সেখানে ভাষাতাত্ত্বিককে রাজনৈতিক ভূমিকাও পালন করতে হয়। তা-ই আন্তরিকভাবে পালন করেছিলেন মুহম্মদ আবদুল হাই।'

এ দুটি উদাহরণে যে বিবরণ আছে, প্রাথমিকভাবে তা ঠিকই আছে। কিন্তু উপস্থাপনার যে ভঙ্গিটা এখানে মুখ্য, তাতে সেকালের পরিস্থিতির বিশেষত আবদুল হাইয়ের তৎপরতার এমন ছবি ফুটে ওঠে, যার কোনো সাযুজ্য বাস্তবে পাওয়া যায় না। এ ধরনের বিবরণী – দুটি মাত্র উল্লেখিত হলেও পাওয়া যায় আরো বিস্তর – দাবি করে, পরিষ্কার দুইভাগে বিভক্ত লড়াই চলছিল; আর মুহম্মদ আবদুল হাই প্রতিপক্ষের শয়তানি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে প্রাণপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আসলে, আমরা আগেই খানিকটা ইঙ্গিত দিয়েছি, এ ধরনের কিছু ঘটেনি। ব্যাপারগুলো আর দশ ঘটনা ও বাস্তবের সাথে অনেক বেশি জড়ানো-মিশানো ছিল; তাতে পরিষ্কার পক্ষ-বিপক্ষ সাব্যস্ত করে

প্রতিপক্ষকে শয়তান হিসাবে স্থির করা এত সহজ ছিল না। একদিকে এ ধরনের শনাক্তির ঘটনা ঘটেছে আরো অনেক পরে। অন্যদিকে, আবদুল হকের মতো মুষ্টিমেয় কেউ কেউ যে-অর্থে বাঙালি জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরির জন্য বিরামহীন লেখালেখি করছিলেন, মুহম্মদ আবদুল হাই মোটেই সে দলের মানুষ ছিলেন না। বাঙালি সংস্কৃতি এবং সে অর্থে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে তাঁর ভূমিকা ছিল একেবারেই অন্য ঘরানার।

বরং নীলিমা ইব্রাহীম ঘটনা-প্রসঙ্গে যে ছবি তুলে ধরেছেন (২০০০ : ৯৪-৯৫), তা অনেক বেশি বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়। তিনি জানাচ্ছেন, মোনায়েম খান একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এক সভায় শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে নাজেহাল করেন। তাঁর 'বাংলাভাষা প্রীতিকে কটাক্ষ করে' বলেন, 'দেশ আপনারে ক্ষমা করবে না'। উপাচার্য ড. ওসমান গনিকে সম্বোধন করে বলেন, 'তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজসিংহ পড়ানো হচ্ছে। তোমারে সাবধান কইরা দিলাম। এসব বন্ধ কর।' নীলিমা ইব্রাহীম লিখেছেন, এসব শুনে 'হাই সাহেব রীতিমত ভয় পেয়েছেন।' পরে নীলিমা ইব্রাহীম গিয়েছিলেন অধ্যাপক ওসমান গনির কাছে। জানতে চেয়েছেন, এখন কী করণীয়? উপাচার্য বলেছেন, 'যা করছেন তাই করে যান, ওসব কথায় কান দেবার দরকার নাই।' হাই সাহেবকে সংবাদটি দেবার পর, নীলিমা ইব্রাহীম লিখছেন, 'তিনি পরম স্বস্তি বোধ করলেন। মুখে হাসি ফিরে এল।' জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলা বিভাগ তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা পূর্ব বাংলার জনগণের সংগ্রামমুখর হয়ে উঠার পটভূমিতে নীলিমা ইব্রাহীম আরো লিখেছেন, 'এসব ক্ষেত্রে প্রফেসর আবদুল হাই খুব সোচ্চার না হলেও বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রেরণা দান করে চলেছিলেন।'

প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে, নীলিমা ইব্রাহীমের বিবরণীতে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের মর্যাদার অবনমন ঘটেছে, আর সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় এবং মনসুর মুসার বিবরণী শুধু আবদুল হাই নয়, বাঙালি জাতীয়তাবাদী বয়ানেরও মর্যাদা বাড়িয়েছে। আসলে ঘটেছে একেবারে উল্টো ঘটনা। শেষোক্ত দুজনের বিবরণ একটি গণতান্ত্রিক উদারনৈতিক পাকিস্তানকে হাজির করে, যেখানে প্রবলপ্রতাপ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভাবাদর্শিক লড়াই চালানো যায়, এবং চরম বিরোধী অবস্থানে থেকেও প্রশাসনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত পদে আমৃত্যু বহাল থাকা যায়। এ ধরনের প্রতীতি শুধু বাস্তবতার লঙ্ঘন নয়, ন্যায় ও যুক্তিরও বিপরীত। তুলনায় নীলিমা ইব্রাহীমের মূল্যায়ন একদিকে সেকালের ভীতিকর বাস্তবতাকে হাজির করে, সরকারের আলটপকা উদ্যোগের ঘোরতর অন্যায্যতাকে উদাম করে দেয়; অন্যদিকে বিভাগীয় প্রধান হিসাবে এসব পরিস্থিতিতে মুহম্মদ আবদুল হাই যে কাজ করবেন ভীতি ও ধৈর্যের যৌথতায়, আর অবতীর্ণ হবেন কুশলী ভূমিকায়, সে সত্যকে সামনে নিয়ে আসে।

জাতীয়তাবাদী বয়ান সাধারণত এসব সূক্ষ্ম ব্যাপারে মনোযোগ দেয়ার অবকাশ পায় না। কাজ করে পক্ষ-বিপক্ষের মোটা দাগে – অনেকটা ধর্ম ও ধর্মানুসারীদের মতো; প্রতিটি পক্ষই যে বিভক্ত থাকে নানা পারস্পরিক মত-মতান্তরে, সেদিকে নজর রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। বস্তুত, রাষ্ট্রক্ষমতা নানা মাত্রার সংখ্যাহীন ক্ষমতাবলয়ের সমন্বিত বহিঃপ্রকাশ, এবং ক্ষমতার এই তুলনামূলক ছোট বলয়গুলো কোনো স্থির সূত্রে ঐকতান রক্ষা করে একজোট হয়ে থাকে না; প্রায়শই আপাত প্রতিপক্ষের সাথেও বেশ ঘনিষ্ঠ আচরণ করে, নানান রকম আপসরফায় স্থিতি রক্ষা করে। একমাত্র বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতেই এরকম ঠেক-দেওয়া স্থিতি ভেঙে পড়ে, আর তৈরি হয় নতুন কেতার ভারসাম্য। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে প্রাথমিকভাবে এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্তমাত্রায় এরকম বৈপ্লবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। মুহম্মদ আবদুল হাই বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে কাজ করেননি। কাজ করেছেন বিরুদ্ধ আবহে। সে কারণেই তিনি কুশলী হয়েছিলেন, এবং পালন করেছিলেন কার্যকর ভূমিকা। তাঁর রচনাবলি ও তৎপরতা বিশ্লেষণ করলে সে সত্যই উন্মোচিত হয়।

এ প্রসঙ্গে *ভাষা ও সাহিত্য* গ্রন্থভুক্ত 'রোমান বনাম বাংলা হরফ' প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায় (মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৯৪/৩ :৬৩-৭১)। এ প্রবন্ধে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ভাষাতাত্ত্বিক প্রজ্ঞা রাজনৈতিক তৎপরতার ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কেউ কেউ। সেকালের পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাংলা ও বাঙালি-বিরোধী তৎপরতার সাথে এক সারিতে দাঁড়িয়ে এ প্রস্তাব কিছু বাড়তি শক্তি সঞ্চয় করেছিল। আবদুল হাই তীক্ষ্ণ কলমে তার সমুচিত জবাব দিয়েছেন। তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব ছিল। কারণ, ভাষাতাত্ত্বিক হিসাবে 'জ্ঞানতাত্ত্বিক' যুক্তি অবলম্বন করেই তিনি এ 'রাজনৈতিক' উদ্দেশ্য হাসিল করতে পেরেছিলেন। উল্লেখ্য, এটি আবদুল হাইয়ের তীক্ষ্ণতম প্রবন্ধগুলোর একটি। প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে তিনি যে কলম হাতে লড়েছেন, তার আভ্যন্তর চিহ্ন প্রবন্ধটির মেজাজে প্রত্যক্ষভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে। সে সাথে ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান আর পরিশ্রম যুক্ত হয়ে একটি সফল তৎপরতার ক্লাসিক উদাহরণ হয়ে রইল রচনাটি। আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাবের জবাবে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যেরকম ভাষাতাত্ত্বিক প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক তেজ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, আবদুল হাইয়ের এ তৎপরতা তার সাথেই তুলনীয়।

এ ধরনের তৎপরতার মূল্যায়নে একাডেমিক আর জাতীয়তাবাদী ঝোঁকের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সহজ নয়। বস্তুত, আমাদের একাডেমিক বয়ানগুলোও জাতীয়তাবাদী ফাঁদে পড়ে তথ্য-উপাত্ত ঠিকমতো উপস্থাপন করতে চায় না। কিছুতেই বলে না, রোমানায়নের প্রস্তাব একটি প্রায় বিশ্বজনীন বাস্তবতা, এ অর্থে যে, দুনিয়ার বহু ভাষার জন্য নানা

কারণে ও যুক্তিতে এ প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে কার্যকরও হয়েছে; খোদ বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেই এ প্রস্তাব পাকিস্তানবাদীদের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, বরং আগেই বহুবার এ প্রস্তাব উঠেছে, উঠেছে পশ্চিম বাংলায়ও, আর প্রস্তাবকারীদের তালিকায় আছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিশ্রুত ভাষাতাত্ত্বিক ও বাংলাভাষাপ্রেমী (Chatterji 1993: 235)। এসব তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের পরেও চমৎকারভাবে দেখানো সম্ভব, বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষমতাচক্রের যোগসাজশে কিভাবে একটা ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা রাজনৈতিক হয়ে ওঠে, আর জাতীয়তাবাদী তৎপরতার সাথে একীভূত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আলোচনাটা বরং 'ইতিহাসে' উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। আমাদের জাতীয়তাবাদী বয়ানের ঝোঁক এক ধরনের ধর্মীয় আবহ তৈরি করা, এবং মিথে সওয়ার হওয়া – ইতিহাসের পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি তাতে খুব সামান্যই দেখা গেছে। বাংলা বর্ণমালা-সংস্কার প্রস্তাব ও এর প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করলে একই বাস্তবতা চোখে পড়বে।

বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের প্রস্তাব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই উঠেছিল, আর পাকিস্তান আমলে নতুন বাস্তবতায় তা বিশেষ শক্তিসঞ্চয় করে। স্বাধীনতার পরে এ বিষয়ক প্রায় সমস্ত আলোচনায় এসব প্রস্তাবকে উপস্থাপন করা হয়েছে 'পাকিস্তানবাদী' হিসাবে, আর এর বিপরীতে যে কোনো অবস্থান গ্রহণকে পাকিস্তানবিরোধী বাঙালি জাতীয়তাবাদী তৎপরতা নাম দেয়া হয়েছে। কিন্তু তথ্য-উপাত্ত বলছে, এ ধরনের সাধারণীকরণ শুধু মিথকে প্রশ্রয় দেয়াই নয়, মিথ্যাচারও বটে। কারণ, বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের প্রস্তাব অতি পুরনো। আর প্রস্তাবকারীদের তালিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন আছেন (১৪০২ : ১৬), তেমনি আছেন এ কালের অধ্যাপক ক্ষেত্রগুপ্ত (১৯৮৬)। পাকিস্তান আমলেও প্রস্তাবকারীদের মধ্যে ইতরবিশেষ ছিল। আমরা এখানে কেবল মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের উদাহরণ দিয়ে দেখাব, সবগুলোকে এক পাল্লায় তুলে মসৃণ জাতীয়তাবাদী ইতিহাস প্রণয়ন কেবল ধর্মভাবাপন্ন মিথকেই প্রশ্রয় দেয় না, পর্যালোচনামূলক জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের তুলনামূলক কার্যকর সম্ভাবনাও নষ্ট করে।

ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব বইয়ের দশম অধ্যায়ের নাম 'বাংলা লিপি ও বানান সমস্যা'। বেশ দীর্ঘ এবং পরিশ্রমসাধ্য কাজ। আবদুল হাই সম্পর্কে যাঁরা লেখালেখি করেছেন, তাঁরা বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া অধ্যায়টির প্রসঙ্গ তোলেননি। অথচ লিপি-সংস্কার সম্পর্কে পাকিস্তান রাষ্ট্র ও তার দেশীয় অনুচরদের যেসব প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন তিনি, সেগুলো সাড়ম্বরে উল্লেখ করেছেন। আলোচনায় যে গলতি আছে তা বলাই বাহুল্য।

মুহম্মদ আবদুল হাই এ অধ্যায়ে বাংলা লিপি ও বর্ণমালার বস্তুত আমূল সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছেন। সেকালে এ ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে সরকারি মহল থেকে বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে

যেসব প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল, তার মধ্যে একমাত্র স্বরচিহ্ন ডানে লেখার মত ছাড়া অন্য যে কোনো মতের সাথে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের প্রস্তাব তুলনীয়। আরো উল্লেখ্য, হাইয়ের প্রস্তাবে সংস্কৃত শব্দ বা তৎসম বাংলা কিভাবে লেখা হবে, তার বিবেচনা কোনো আলাদা মনোযোগ পায়নি; অন্যদিকে আরবি-ফারসি লেখার ব্যাপারটা অংশত হলেও বিবেচনায় এসেছে। বিবেচনার এ ধরনটা হয়ত বাস্তবের সাথে মোলাকাত বা মোকাবেলার ফল; কিন্তু এ কথা প্রচার থাকা দরকার, এ দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিম বাংলায় বাংলা লিপি ও বানান সংস্কারের যে বিপুল প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল, তা থেকে ভিন্ন।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছিল সাতষট্টির ডিসেম্বর বা আটষট্টির শুরুতে। ভূমিকার তারিখ দেখে তাই মনে হয়। এটি ছিল একটি পরিবর্তিত সংস্করণ। ফলে এ মত আবদুল হাইয়ের তুলনামূলক আগের মত – এরকম বলারও কোনো উপায় নাই।

প্রশ্ন হল, এতগুলো প্রাথমিক 'তথ্য' গোপন করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্স কী হাসিল করতে চায়? খুব সহজে শত্রু চিহ্নিত করা এবং কম পরিশ্রমে দেশপ্রেম জাহির করা ছাড়া এর আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? বস্তুত, এ দৃষ্টিভঙ্গি গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের বাংলা ভাষার প্রমিতায়নে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করে আসছে। যে কোনো সংস্কার-উদ্যোগকেই খুব সহজে মিলিয়ে দেয়া যাচ্ছে পাকিস্তানবাদী তৎপরতার সাথে, যেনবা সংস্কার-উদ্যোগ কেবল পাকিস্তানপন্থিরাই নিয়েছিল। জাতীয়তাবাদী সারল্যজনিত এই মিথ্যাচার খুবই ক্ষতিকর হয়েছে। অথচ এদিক থেকে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের রচনা ও তৎপরতা কেবল 'আধুনিক'ই ছিল না, একে অন্যতর জাতীয়তাবাদী তাৎপর্যে বিশ্লেষণের সুযোগও ছিল অনেক বেশি। যেখানে ১৯৬৭-৬৮ সালে প্রকাশিত বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে সংস্কার-প্রস্তাব অক্ষুণ্ন রাখছেন, সেখানে ১৯৬৬ সালে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রস্তাবিত বর্ণমালা ও বানান সংস্কারের তীব্র বিরোধিতা অন্যান্য পণ্ডিত ও ভাষাতাত্ত্বিকদের সঙ্গে তিনিও [মুহম্মদ আবদুল হাই] করেছিলেন। তাঁর বিরোধিতার প্রধান যুক্তি ছিল যে ভাষার ক্ষেত্রে কোনো সংস্কার জোর করে চাপিয়ে দেয়া বা চালু করা যায় না। কোনো সংস্কার যদি গ্রহণ করতে হয় তা স্বাভাবিক নিয়মেই করতে হবে।' (আজহার ২০০০ : ১২৩) এ অবস্থান খাঁটি লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গির ফসল। আর এ অবস্থান খুব জোরালোভাবে এক নিপীড়ক রাষ্ট্রযন্ত্রকে চিহ্নিত করে, যে রাষ্ট্র জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হতে না দিয়ে আরোপিত ছাঁচে বেঁধে ফেলতে চায়। এ বাস্তবতা এক মজলুম জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষাকে খুব গভীর ন্যায্যতা দেয়। আমাদের জাতীয়তাবাদী আখ্যান অবশ্য এটুকু বিলম্ব সহ্য করতে সম্মত নয়। সে চায় শত্রু-মিত্রের জল-অচল বিভাজন। এমনিতেই মতাদর্শ ছাঁচ মেনে বিবরণী তৈয়ার করে বলে ডিসকার্সিভ চর্চাকে ধারণ করা

তার পক্ষে সম্ভব হয় না। আর সে ছাঁচ যদি হয় অতিমাত্রায় সংকীর্ণ, তাহলে তাকে প্রতিনিয়ত আশ্রয় নিতে হয় লুকোছাপা আর গোঁজামিলের। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের জীবন ও রচনার সাথে তাঁর মূল্যায়নকারীদের রচনা মিলিয়ে পড়লে এ সত্য বারবার সামনে চলে আসে।

৫

বিপুল অধিকাংশ ভাষ্যকার মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের জীবনের দুটি তথ্য নিয়ে খুব ঝামেলায় পড়েছেন। যে দৃষ্টিভঙ্গির অনমনীয় শাসনে তাঁরা তাঁর জীবনকে পড়তে চেয়েছেন, তার মধ্যে এ দুই তথ্যকে জুতমতো আঁটাতে না পারায় এক ধরনের অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। একটি তথ্য হল, আবদুল হাই জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়েছিলেন; অন্যটি হল, তিনি ছিলেন পরহেজগার বা আমলকারী মুসলমান।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৯৪ : পাঁচ-ছয়) সংক্ষিপ্ত জীবনীর প্রয়োজনেই মাদ্রাসার তথ্যটি উল্লেখ করেছেন; আর তার পরপরই মন্তব্য করেছেন : 'তাঁর শিক্ষার ভিত্তিটা ছিলো ধর্মীয়, কিন্তু তিনি ওই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন।' সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় (২০০০ : ১০১) ব্যক্তির সাথে সমাজকেও সঙ্গী করেছেন : 'যে কালে তাঁর জন্ম তখন মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষার হাওয়া কিছুটা বইতে শুরু করলেও ব্যাপকভাবে মুসলমান সমাজ তখনও কিছুটা পশ্চাতমুখীই ছিল। মুহম্মদ আবদুল হাই-ও তাই দোটানার মধ্যে পড়েছিলেন। তাই আধুনিক ইংরেজী স্কুলে নয় মক্তব মাদ্রাসায়ই তাঁর শিক্ষার সূচনা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মেধাবী ছাত্র আবদুল হাই আধুনিক শিক্ষার সদর রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন...।' মনিরুজ্জামান লিখেছেন (২০০০ : ১৯৯) : 'উচ্চ মাদ্রাসার ছাত্র হয়েও তিনি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র প্রেরণায় বাংলা নিয়ে পড়াশুনা করেন ও মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সম্মান ও গৌরব অর্জন করেন।' আবুল কাশেম চৌধুরীর (২০০০ : ৩৮৪) ভাষ্য এরকম : 'তিনি স্বয়ং বংশগত ধারা অনুসরণ করে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার একজন মেধাবী ছাত্র হয়েও পরবর্তীকালে সাধারণ মুক্ত শিক্ষাধারায়ও সমান পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন।'

দৈবচয়নের ভিত্তিতে এখানে কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা হল। এ সম্পর্কে অন্য যাঁরা মন্তব্য করেছেন, তাঁদের বাক্যের গড়ন ও সুর প্রায় একই রকম। ব্যাপারটা অন্তত খানিকটা বিস্ময়কর বৈকি। ধর্মীয় ধারায় পড়াশোনা করেছেন, এবং পরে 'সেক্যুলার' ধারায় অবদান রেখেছেন, বাঙালি মুসলমানের আধুনিক কালের ইতিহাসে এমন ব্যক্তির সংখ্যা কম হলেও নগণ্য নয়। আবদুল হাইয়ের আগে ও পরে এরকম উদাহরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। বাঙালি হিন্দুর আধুনিক ইতিহাসে বা ইউরোপীয় আধুনিক ইতিহাসেও এ

ধরনের ঘটনা দেদার ঘটেছে। পাদ্রি হয়েও তিনি বিজ্ঞানে বড় অবদান রেখেছেন – গ্রেগর মেনডেল সম্পর্কে এমন বাক্য নিশ্চয়ই খুব সুলভ নয়। কারণ, পশ্চিমে এ ধরনের উদাহরণ রীতিমতো প্রচুর। তার মানেই হল, আমাদের উদ্ধৃত উপরের মন্তব্য চারটি নিরীহও নয়, কাকতালীয়ও নয়।

মন্তব্যগুলো বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকেও গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের চল্লিশ ও পঞ্চাশের কৃতী ব্যক্তিদের অনেকেই জবরদস্ত মৌলানার সন্তান ছিলেন। সমাজ-বিকাশের খুব সাধারণ সূত্র মোতাবেক এরকমই হওয়ার কথা। পূর্ব বাংলার ভূমিনির্ভর তুলনামূলক সচ্ছল পরিবারের ছেলেরা প্রধানত কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ার সূত্রে বিত্তের পাশাপাশি শিক্ষার বনেদিয়ানাও হাসিল করেছিলেন। তাঁদের ছেলেদের অনেকেই [মেয়েরা সাধারণভাবে তখনো এ ধারায় প্রবেশ করেনি] রাজধানী ঢাকার প্রথম জমানার বুদ্ধিবৃত্তিক-সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এ ধরনের ডাহা বাস্তবে অনেকেই অকারণ অস্বস্তি বোধ করেন, আর কল্পিত বৈপরীত্য সাজিয়ে বিবরণীকে স্বস্তিদায়ক করতে চান। সে এতটাই যে, ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির লেখায় একটা প্রসঙ্গে একই ধরনের চিন্তার প্রতিফলন দেখতে পাই।

বাক্যগুলোর গড়ন পরীক্ষা করলে পরিষ্কার বোঝা যায়, প্রভাবশালী ডিসকোর্সের বশ্যতাই বিরোধার্থক অব্যয়ের দুপাশে দুই বিপরীতের সন্নিবেশ ঘটিয়েছে। বাক্যের এই গঠন ওই প্রভাবশালী ডিসকোর্সে ক্রিয়াশীল অনুমান সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত করে। এর প্রতিফলন দেখি মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ধর্মাচরণ সম্পর্কিত মন্তব্যেও। প্রায় সবার উপস্থাপনাকে সারমর্ম আকারে এ ধরনের একটি বাক্যে প্রকাশ করা যাবে : তিনি ধার্মিক হলেও গোঁড়া ছিলেন না। এ ধরনের মন্তব্যের নিহিতার্থ অত্যন্ত আপত্তিকর। এগুলো কোনো প্রকার রাখঢাক না রেখেই বলতে চায়, ধার্মিক মুসলমান হিসাবে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের গোঁড়া ইত্যাদি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সৌভাগ্যবশত তিনি সেরকম কিছু হননি। আজকাল, উপস্থাপনাজনিত স্পর্শকাতরতার এ জমানায়, এ ধরনের উচ্চারণ যে কত ভয়াবহ 'বিচ্যুতি', তা ওয়াকিবহাল ব্যক্তিমাত্রই জানেন। কিন্তু 'আধুনিক' জমানায়ও – যখন একরোখা 'সত্যে'র ব্যাপারে মানুষ অনেক বেশি প্রত্যয়ী ছিল – এ ধরনের উচ্চারণের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বর্ণবাদ, ঘৃণা ও অপরায়ণের ঝুঁকি কোনো গোপন ব্যাপার ছিল না। অথচ, আমাদের মূলধারার পণ্ডিতবর্গ এ ধরনের বাক্য অবলীলায় লিখে গেছেন। প্রভাবশালী ডিসকোর্স কতটা ধর্মের আকার নিলে আর তার সংকীর্ণতা কতটা চরমে পৌঁছালে বাস্তবে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, তা অনুমান করাও বুঝি সহজ নয়।

এ ধরনের মন্তব্য ও বিশ্লেষণ পড়ে যে কারো মনে হতে পারে, হাই সাহেবের লেখাপত্রে বা নিদেনপক্ষে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে তিনি বোধ হয় তাঁর শিক্ষার শুরুর দিকটা নিয়ে অস্বস্তি প্রকাশ করেছেন; কিংবা ধর্মাচারে গোঁড়ামির সম্ভাবনা বা বাস্তবতা টের পেয়ে তাঁর লেখালেখিতে সে সম্পর্কে পরিষ্কার দিকনির্দেশনা রেখে গেছেন। আসলে ঘটেছে ঠিক উলটা। তাঁর সংশ্লিষ্ট রচনাদির প্রাথমিক পাঠেই সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৬৫) সংযোজিত 'বিদ্যাপতি কাব্যপাঠ' প্রবন্ধে (১৩৬৭) লেখক চৈতন্যের ভাববিপ্লবকে বঙ্গে তদ্দিনে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি ভাবের মোকাবেলা হিসাবে পাঠ করেছেন। এটা জনপ্রিয় পাঠ। কিন্তু তিনি এ বিপ্লবকে মিলিয়েছেন শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের সাথে। তাঁর মতে, দক্ষিণ ভারতে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ও হিন্দুদের ধর্মান্তরের আতিশয্যহেতু শঙ্করাচার্য এ ধরনের তত্ত্ব প্রচারে উৎসাহী হয়েছিলেন। লক্ষণীয়, বিদ্যাপতি পড়ার জন্য সাধারণত এসব কম উল্লেখিত হয়। ধরে নেয়া হয়, বিদ্যাপতি চৈতন্যপূর্ব কবি হওয়ায় তাঁর কাব্যপাঠের জন্য চৈতন্যযুগের সূত্র দরকারি নয়। কিন্তু আবদুল হাই শুধু এটুকুর উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি, বিদ্যাপতির কাব্যপাঠের জন্য তিনি সুফিভাব ও ফারসি সুফি কবিদের টেনেছেন; মধ্যযুগের ভারতে হিন্দু-মুসলমান যৌথভাবের কবিদের কথাও তুলনামূলক কায়দায় উল্লেখ করেছেন। (মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৯৪/১ : ৩৫১-৩৮৯)

বস্তুত, *সাহিত্য ও সংস্কৃতি* গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলোর নাম, বিষয় এবং অন্তর্নিহিত দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভুলভাবে সাক্ষ্য দেয়, পাকিস্তান আমলে এ অঞ্চলে মুসলমান-প্রধান সাহিত্যচর্চার মূলধারার সাথে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের একবিন্দুও ফারাক ছিল না। এমনকি বেশ কিছু প্রবন্ধে তিনি রীতিমতো 'মুসলমানি' ছাড়িয়ে 'ইসলামি' ভাব ও ভাষা অবলম্বন করেছেন। 'বাংলাদেশে মুসলিম অধিকারের যুগ ও বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধে 'মুসলমান কর্তৃক বাঙলা দেশ বিজয়ই বাঙলা দেশের সংস্কৃতি-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অশেষ কল্যাণের হয়।' – দীনেশ সেনের এই বহুল-উদ্ধৃত মন্তব্য মুহম্মদ আবদুল হাই নিজের মতো করে উদ্ধৃতি-চিহ্ন ছাড়াই ব্যবহার করেছেন। বলেছেন, 'হিন্দু আমলে জনসাধারণ ছিল অবহেলিত, তাদের ভাষাও ছিল অপাংক্তেয়। সাংস্কৃতিক ভাষা হিসাবে তারা সংস্কৃতেরই চর্চা করছিল। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার কোন মর্যাদাই ছিল না। মুসলমানেরা এদেশে রাজার বেশ ধরে আসার কিছুদিনের মধ্যেই এদেশের সাধারণ মানুষের ভাষার দিকে তাদের নজর পড়লো। মুসলমান শাসনকর্তারা ইরান তুরান যেখানকারই হোকনা কেন এদেশে আসার পর, এদেশকে ভালবেসেছিলেন' (মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৯৪/১ : ৩৯১)। এ প্রবন্ধেরই অন্যত্র তিনি অধিকতর সহি ইসলামি মনোভঙ্গির ভাষায় কথা বলেছেন (১৯৯৪/১ : ৩৯১) :

> রাজা, প্রজা, দাস ও প্রভুতে সেখানে [ইসলামে] কোন বিভেদ নাই। বাদশাহও দাস বিয়ে করছে, দাসও বাদশাহ হচ্ছে। উপাসনার পদ্ধতিতে ও সমাজ ব্যবস্থায় এদেশের মানুষ সবচেয়ে ছিল অবহেলিত, ইসলাম প্রচারকদের ও ধর্মাবলম্বীদের সংসার জীবনে তাই মানবতার স্বীকৃতির এ মনোমুগ্ধকর রূপ দেখে এদেশের অগণিত জনসাধারণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছিল।

এই ভাষা কার্যত বিশ শতকের গোড়া অথবা তারও আগে থেকে বিকশিত বাঙালি মুসলমান সংস্কৃতিসেবীদের সাধারণ ভাষা। ১৯৫১-র এ লেখায় সারল্য আছে। কিন্তু মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের জীবদ্দশায় তাঁর এ ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক কোনো রূপান্তর হয়নি।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে গ্রন্থভুক্ত 'লালন শাহ ফকির' প্রবন্ধে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে, তাকে বলতে পারি, কলকাতার চর্চার বিপরীতে বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের লালন-অধিগ্রহণের কালে গড়ে ওঠা ভাষার অনুসরণ। লালনের জাত প্রসঙ্গে তাঁর ভাষ্য (১৯৯৪/১ : ৪২৪-২৫) : 'তিনি হিন্দু না মুসলমান যে ঘরেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি মুসলমানই ছিলেন।... আমাদের মতো শরীয়তপন্থী মুসলমান না হলেও সুফীসাধক বেশরাহ ফকীর হিসেবে যতটুকু মুসলমান থাকা যায় তিনি তা-ই ছিলেন।' অন্যত্র তিনি (১৯৯৪/১ : ৪২৮) লালনের ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন এ ভাষায় :

> বাউল কবি হিসেবে লালন ফকির একদিকে যেমন দেহের সাধনা করেছেন, সুফী প্রভাব বশতঃ অন্যদিকে তেমনি আল্লাহ্‌কে পাবার আশায় মুর্শিদেরও আরাধনা করেছেন। এ মুর্শিদ তাঁর কাছে 'ইনসানে কামেল' হযরত মুহম্মদ (দঃ)। সুফী সাধনায় পীর বা গুরুবাদের প্রয়োজন হয় আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করার জন্য। যথারীতি খোদা প্রাপ্তির সাধনা করতে পারলে দেখা যায় – আল্লাহ্ প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ দেহের ঘাড়ের শিরা উপশিরার চেয়েও তার নিকটবর্তী। ... লালন তাঁর সাধনায় হযরত মুহম্মদকে (দঃ) মুর্শিদ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাছে 'আহাদ' (এক আল্লাহ্) এবং 'আহমদ' (যিনি প্রশংসিত অর্থাৎ হযরত মুহম্মদ দঃ) এর মধ্যে কেবল মিম হরফেরই ব্যবধান। সুতরাং তাঁর বিশ্বাস নবীকে ধরতে পারলে খোদাকে পাওয়া দুষ্কর হবে না।

ইসলামি পরিভাষা ও দর্শনের ছাঁচে লালনপাঠের সংকট আজ আমাদের কাছে আর অজানা নয়। এখানে লম্বা উদ্ধৃতি দেয়া হল মূলত সেকালের প্রভাবশালী ভাষাকাঠামোর অনুসরণে মুহম্মদ আবদুল হাই যে বিমুখ ছিলেন না, এবং সে ভাষাটা যে বেশ 'ইসলামি', তার নজির হিসাবে। 'ইসলামের শাসন সংহতি', 'মুসলিম ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা', 'মুসলিম ভারতে স্ত্রী শিক্ষা' – *সাহিত্য ও সংস্কৃতি* গ্রন্থের এসব প্রবন্ধ শুধু সেকালের

মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক নয়, একজন ইমানদার মুসলমানের উচ্চারণও তাতে পরিষ্কার পড়া যায়।

অথচ আবদুল হাইয়ের ভাষ্যকারেরা ব্যতিক্রমহীনভাবে এ 'তথ্য' গোপন করতে চেয়েছেন। প্রচলিত-প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী বয়ানের যে মোকামে তাঁরা আবদুল হাইকে স্থাপন করতে পারছিলেন, তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়াই সম্ভবত এর কারণ। এরকম অনুমানের মূল ভিত্তি এই যে, যেসব তথ্য গোপন করার সুযোগ ছিল না, সেগুলোকে 'সঙ্গতিপূর্ণ' করার স্বার্থে তাঁরা অগ্রহণযোগ্য যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *ইসলামের বৈপ্লবিক ভূমিকা* – এমনি এক 'বিপজ্জনক' তথ্য। এ বই সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ (১৯৯৪ : সাত-আট) লিখেছেন :

> মুসলমানিত্বের অহমিকা বা পাকিস্তানবাদ প্রচারের জন্যে তিনি ইসলামবিষয়ক একটি বই বেছে নেন নি অনুবাদের জন্যে, অমন উদ্দেশ্য থাকলে তিনি কোনো গোঁড়া মুসলমানের লেখা বই বেছে নিতেন; তিনি নিয়েছেন একজন বিজ্ঞানমনস্ক হিন্দুর লেখা বই, যিনি ইসলামের অবদান উদঘাটন করেছেন কিন্তু তার ঐশিতা স্বীকার করেন নি। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের মুক্তমনের পরিচয় বহন করছে এ-অনুবাদটি।

মুহম্মদ আবদুল হাই একটি বই অনুবাদ করেছিলেন – সংক্ষিপ্ত জীবনীতে এ তথ্যটির উল্লেখই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু গ্রন্থটির নাম *ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা* বলেই, বিদ্যমান প্রভাবশালী চিহ্নব্যবস্থায় এ নামের অন্যতর ব্যঞ্জনার সম্ভাবনা আছে বলেই, হুমায়ুন আজাদ হয়ত কৈফিয়ত দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন। আর এর আসলে কোনো কৈফিয়ত হয় না বলেই, আজাদ উৎপাদন করলেন এমন যুক্তি, যা নিজেই নিজেকে খারিজ করে। যে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে, 'বিজ্ঞানমনস্ক হিন্দুর' 'ইসলামবিষয়ক' বইয়ের বাইরে অনুবাদের জন্য সংখ্যাতীত বিকল্প আছে; আর সিদ্ধান্ত নিতে পারে, ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য 'বিজ্ঞানমনস্ক হিন্দুর' মাহাত্ম্যবর্ণনামূলক বই 'গোঁড়া মুসলমানের' লেখা বইয়ের চেয়ে অনেক ভালো। উল্লেখ্য, কোরানের ঐশিতা আর ইসলামের দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে গ্রন্থকারের বয়ান-যে মুসলমানদের বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, আবদুল হাই ভূমিকায় তা উল্লেখ করে দিয়েছেন। হুমায়ুন আজাদের বিবরণী থেকে যে কারো মনে হতে পারে, কোরানের ঐশিতা সম্পর্কে মূল গ্রন্থকারের মতামতে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের স্বীকৃতি না থাক, অন্তত বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু অনুবাদকের ভূমিকা বিপরীত সাক্ষ্যই দেয়।

৬

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গির বিবরণীতেও তথ্য ও যুক্তির গড়াপেটার বিস্তর কসরত দেখতে পাই। রাষ্ট্রটির প্রতি তিনি যে খুব বীতরাগ ছিলেন, সে ব্যাপারে ভাষ্যকারদের ভিন্নমত খুব একটা চোখে পড়ে না। দাবিটি শুধু বড্ড বেশি নয়, অপ্রয়োজনীয়ও বটে। তখন পাকিস্তানই ছিল রাষ্ট্র, আর অন্তত ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের আগে রাষ্ট্রবিরোধী উচ্চারণ রোমান্টিক স্বপ্নবিলাস মাত্র। বাঙালি জাতীয়তাবাদী বয়ানে বায়ান্নের যে অবস্থান, ভাবনাবীজ হিসাবে তাকে যৌক্তিক বলা যায়, কিন্তু কার্যকর বাস্তবতা হিসাবে নয়। কারণ, এ ধরনের প্রকল্প চুয়ান্নর নির্বাচনই ব্যাখ্যা করতে পারে না। তাছাড়া, ভাষা আন্দোলনের সময়ে মুহম্মদ আবদুল হাই ইংল্যান্ডে ছিলেন, আর ফিরে আসার পরেও এ ব্যাপারে অন্তত লিখিত আকারে কোনো উল্লেখযোগ্য লিপ্ততা দেখাননি। কাজেই, পাকিস্তান রাষ্ট্র সম্পর্কে তিনি সুযোগ পেলেই বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন – এ ধরনের একটা অপ্রয়োজনীয় কষ্টকল্পনা ভাষ্যকারদের করতে হয়েছে নিশ্চয়ই জাতীয়তাবাদী বয়ানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রয়োজনেই।

এই ভাষ্যটিকে জনপ্রিয় করেছেন হুমায়ুন আজাদ। রচনাবলির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন (১৯৯৪ : দশ) : 'তাঁর লেখা পরিচয় দেয় যে একজন গভীর বাঙালি বাস করতো তাঁর ভেতরে। তাঁর বিভিন্ন লেখায় ফিরে ফিরে বসেছে 'বাঙালি', 'বাঙলা', 'পূর্ব বাঙলা', 'বাঙলাদেশ' প্রভৃতি শব্দ।' স্মারকগ্রন্থ (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : ২০০০) সাক্ষ্য দিচ্ছে, এ বিবরণী অন্য ভাষ্যকারদেরও বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। তথ্য হিসাবে কথাগুলো আংশিক সত্য। আর যে তাৎপর্যে আজাদ এবং অন্যরা এগুলোর উল্লেখ করেছেন, তা খুবই গোলমেলে। এ উল্লেখ গোপন করে যে, ১৯৫৬ সালের আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক নামই ছিল পূর্ব বাংলা। 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম হয়েছে পরে। অথচ আবদুল হাই রচনাবলিতে 'পূর্ব পাকিস্তান' নামের ব্যবহার আগে থেকেই বিস্তর পাওয়া যায়। তাছাড়া, 'বাঙালি', 'বাংলা' বা 'বাংলাদেশ' নামপদগুলো 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রের সাথে আবশ্যিক কোনো বিরোধ তৈরি করে না, যেমন পশ্চিম বাংলায় 'বাঙালি' শব্দের ব্যবহার 'ভারত' রাষ্ট্রের বিরোধিতা বোঝায় না। তদুপরি, এ নামগুলো ব্যবহারের জন্য 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী' হওয়ার কোনো দরকার ছিল না। কারণ, এটাই ছিল সাধারণ রেওয়াজ। পরের বাংলাদেশ জমানায় ব্যাপকভাবে 'পাকিস্তানপন্থি' হিসাবে বর্ণিত আবুল মনসুর আহমদ তাঁর সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক প্রকল্পে পাকিস্তানি সংস্কৃতি নিয়ে একবর্ণও উচ্চারণ করেননি। তাঁর আগ্রহ ছিল বাঙালি মুসলমান এবং পূর্ব বাংলায়। 'রবীন্দ্র-বিরোধী' হিসাবে পরিচিত সৈয়দ আলী আহসান মধ্য-ষাটে কেবল রবীন্দ্রনাথ নিয়ে 'উৎকৃষ্ট' কবিতাই প্রচার করেননি, 'আমার পূর্ব বাংলা' নামে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতাটিও

লিখেছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে, 'বাংলা', 'পূর্ব বাংলা' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি কোনোপ্রকার বিরূপতা প্রকাশ করে – যুক্তি হিসাবে এর কোনো সারবত্তা তো নাইই, তথ্যগত প্রাথমিক যোগ্যতাও অনুপস্থিত।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৯৪ : এগারো) সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করেছেন মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের একটি ছাত্রপাঠ্য রচনা 'পূর্ব-পাকিস্তান'। তিনি অনুমান করেছেন, '১৯৫৭ সালে কিশোরদের জন্য লেখা এবং তাঁরই সংকলিত বইয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান আমার দেশ' বলা বেশ আপত্তিকর ছিল।' 'আপত্তিকর' কথা কারো ব্যক্তিগত রচনায় থাকতেও পারে, কিন্তু ছাত্রপাঠ্য বইতে তো তা হওয়ার কথা নয়। এ বিষয়ে কেউ কখনো আপত্তি করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার মানেই হল, আজাদ এবং অন্য অনেকেই পরবর্তীকালে যে তথ্যটিকে 'আপত্তিকর' হওয়ার কথা ভেবেছিলেন, সেটা আসলে 'আপত্তিকর' ছিল না। সবার কাছেই তা স্বাভাবিক গণ্য হয়েছিল। এ রচনায় 'পূর্ব পাকিস্তানে'র নামে বাংলার প্রকৃতির বিবরণ থাকায়, আর বাংলার প্রতি আবেগ প্রকাশিত হওয়ার সূত্র ধরে হুমায়ুন আজাদ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুহম্মদ আবদুল হাই 'আন্তরিক বাঙালি' ছিলেন। লিখেছেন : 'বাঙলার পল্লীকবিও যখন মেতে উঠেছিলেন পাকিস্তান ও উর্দুফারসিতে, তখন মুহম্মদ আবদুল হাই থেকেছেন আন্তরিক বাঙালি।' এ মন্তব্য ঠিক ধরে নিয়ে আমরা বলব, তাঁর রচনাবলি ব্যাপকভাবে সাক্ষ্য দেয়, 'আন্তরিক বাঙালি' থেকেও মুসলমান পরিচয়কে সমানতালে ধারণ করা যায়, এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিও অনুগত থাকা যায়। বিখ্যাত রচনা *বিলেতে সাড়ে সাত শ দিন* (১৯৫৮) সে সাক্ষ্যই বহন করছে।

বিলেতে সাড়ে সাত শ দিন গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে, যদিও লেখা হয়েছিল আরো আগেই। রচনাবলিতে গৃহীত হয়েছে ১৯৭০ সালের সংস্করণ (হুমায়ুন ১৯৯৪/১ : ৬৫৯)। মুহম্মদ আবদুল হাই বিলাতে ছিলেন তিরিশোর্ধ বয়সে। কাছাকাছি সময়ের রচনাটিতে স্বভাবতই আবেগের ছাপ আছে। তবে, লেখকের জীবদ্দশায় অনেকগুলো সংস্করণ হয়েছে বলে সংশোধনের সুযোগ ছিল। এ বইতে প্রকাশিত মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা এমন মর্যাদায় বিবেচনা করতে পারি যে, পরবর্তী জীবনে তার বদল যদি ঘটেও থাকে স্বীকার না করার মতো কিছু ঘটেনি।

বইজুড়ে যে ব্যাপারটা অন্তত এখনকার পাঠকের কাছে দৃষ্টিকটু মনে হবে তা হল, ইংরেজ ও ইংল্যান্ডের প্রশংসার ক্ষেত্রে বিস্তর অতিশায়ন। এটা রীতিমতো বিস্ময়কর যে ইংল্যান্ডের বর্তমান বাস্তবতা বর্ণনা করতে গিয়ে পুরনো ইতিহাস হিসাবে দুটি বিশ্বযুদ্ধের কথা অনবরত উল্লেখ করলেও সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে অব্যবহিত আগেই ক্রিয়াশীল ইংল্যান্ডের কথা লেখক উল্লেখযোগ্যই মনে করেননি।

বিলাতের এই বিখ্যাত বিবরণ থেকে যদি মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ব্যক্তিসত্তার পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্নগুলো খুঁজে নিতে চাই, তাহলে তিনটি পরিচয়কে বড় হয়ে উঠতে দেখব। প্রথমত, পূর্ববঙ্গবাসী হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করা। এ ধরনের বিবরণ বইটিতে অনেকবার পাওয়া যায়। কোনোটিতেই আলাপটা সংস্কৃতির নয়, বরং প্রকৃতির। হুমায়ুন কবিরের *বাংলার কাব্য* যে মুহম্মদ আবদুল হাইকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, তাঁর রচনাবলিতে এর প্রমাণ বিস্তর মেলে। প্রত্যক্ষভাবে উদ্ধৃতি হিসাবেও বইটি তিনি ব্যবহার করেছেন। হুমায়ুন কবির তাঁর গ্রন্থে হিন্দু-মুসলমান যৌথতায় বাঙালি জনগোষ্ঠীর যে কংগ্রেস ঘরানার পরিচয়লিপি তৈরি করেছেন (মোহাম্মদ আজম ২০০৬), মুহম্মদ আবদুল হাই সে প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। তিনি সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যায় না গিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যের যে ব্যাখ্যা হুমায়ুন কবিরে আছে, তাকেই আশ্রয় করেছেন।

দ্বিতীয় যে পরিচয় *বিলেতে সাড়ে সাত শ দিন* বইতে প্রধান হয়ে উঠেছে, তা লেখকের মুসলমান পরিচয়। সে পরিচয়ে আবার জাতিবাচক মুসলমানত্বের সাথে সাথে মাঝে-মধ্যেই ইসলামি পরিচয়ও গুরুত্ব পেয়েছে। বস্তুত, লন্ডনে বসবাসকালে সাংস্কৃতিক পরিচয় হিসাবে আবদুল হাইয়ের কাছে বাঙালিত্ব বিশেষভাবে বড় হয়ে উঠেছে বা নতুন করে আবিষ্কৃত হয়েছে, এমন নজির এ বইতে প্রায় পাওয়াই যায় না। কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে মুসলমান পরিচয়টা তিনি বারবার আবিষ্কার করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ :

> 'বড়োদিন এদের উৎসবের দিন। আমাদের ঈদের দিনের মতো আনন্দের দিন।' (পৃ. ৫৫৪)

> 'পরী বিবির কবর আর লালবাগ কেল্লার সুড়ঙ্গ পথ দেখবার জন্যে সদলবলে সেখানে হাজির হয়ে মুসলিম শাসনের সমাধি দেখেছিলাম। ... এককালে মুসলমানদের যা ছিল বিলেতে এসে দেখেছি পুরো মাত্রায় তার বিকাশ করেছে ইংরেজরা।' (পৃ. ৫৮১-৮২)

> 'লন্ডনে পৌঁছার দু'দিন পরেই আমরা বকরাঈদের নামাজ পড়তে গেলাম লন্ডন থেকে মাইল তিরিশেক দূরে ওকিং মসজিদে। ... বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হবে। মসজিদ কমিটির সৌজন্যে অন্তত একটি বেলার জন্যে সিদ্ধ খাবারের দেশে মুফ্‌তে রসনা পরিতৃপ্তিকর পাকিস্তানী খানা খাওয়া যাবে। আরও দেখা যাবে দুনিয়ার নানা জাতির মুসলমানকে।' (পৃ. ৫৮৩)

> 'ইসলামের এ সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের রূপ দেখেই ওকিং মসজিদে ইমামের হাতে হাত রেখে কয়েকজন ইংরেজ মহিলা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।' (পৃ. ৫৮৬)

> 'মানুষকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্যে পথ থেকে একটি কাঁটা সরিয়ে দেওয়া ইসলামে ঈমানের লক্ষণ। অপরের প্রতি বিবেচনা থেকেই এই ধর্মপ্রবণতার জন্ম। ইংলন্ডের সাধারণ মানুষের মধ্যে এ গুণের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।' (পৃ. ৬১৪)

তৃতীয় যে পরিচয় বেশ বড় হয়ে উঠে এসেছে, সেটা পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় পরিচয়। এর কতকাংশ সেকালের সাধারণ বাস্তবতা। অর্থাৎ, উল্লেখ করতেই হয়। কিন্তু এ বইয়ের সংশ্লিষ্ট বেশিরভাগ উল্লেখ আরেকটু বেশি দাবি করেছে। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মুসলমান দেশ হিসাবে পাকিস্তানের উল্লেখ আছে। পাকিস্তানের বড় শহর আর বিমানবন্দরের উল্লাসমুখর বিবরণ আছে। আর জিন্নাহর কবরের সৌধ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা হয়ত সেকালের বহু মানুষের মনের কথাই।

নিঃসন্দেহে সাতচল্লিশের খুব কাছাকাছি সময়ে লেখা এ ভ্রমণকাহিনিতে এরকমই হওয়ার কথা ছিল। এটাই স্বাভাবিক। পরের সংস্করণগুলোতে এ ধরনের বিবরণ যে বদলায়নি, বা দৃষ্টিভঙ্গি যে বদলানো হয়নি, তার একটা ব্যাখ্যা এরকম হতে পারে যে, কলেজপাঠ্য সংস্করণ হিসাবে বইটি বজায় থাকা আর্থিকভাবে লাভজনক ছিল, এবং একইসাথে এরকম বহুপঠিত একটি বই থেকে অংশগুলো বদলানোর ঝুঁকিও ছিল। কিন্তু এর কোনোটিই একথা বলার কোনো সুযোগ তৈরি করে না যে আবদুল হাই নিজে এ অবস্থান থেকে সরে এসেছিলেন। রচনাবলির সম্পাদক জানিয়েছেন (হুমায়ুন ১৯৯৪/১ : ৬৫৯), ১৯৬০ সালে হাই সাহেব নিজে এক কপি বইতে কিছু সংশোধন লিখে রেখেছিলেন, যেগুলো পরের সংস্করণে সবটা অনুসৃত হয়নি। কিন্তু ওই সংশোধনীতে এ ধরনের কোনো বক্তব্যের সংশোধন-প্রস্তাব ছিল বলে সম্পাদক উল্লেখ করেননি। ব্যাপারটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে, কোনো পরিবর্তন-প্রস্তাব, যা পরের সংস্করণে কোনো কারণে বাস্তবায়ন করা যায়নি, থাকলে সম্পাদক তা অবশ্যই উল্লেখ করতেন।

৭

পাকিস্তান আন্দোলন, সাতচল্লিশের দেশবিভাগ এবং পাকিস্তানবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আবদুল হাই রচনাবলির আরেক স্পর্শকাতর এলাকা, যা তাঁর ভাষ্যকারদের জন্য স্বস্তিকর হয়নি। বিশেষত প্রচলিত-প্রতিষ্ঠিত বাঙালি জাতীয়তাবাদের বার্তাবাহক হিসাবে যাঁরা তাঁকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন, তাঁদের জন্য এ ব্যাপারগুলো হয়েছে বিশেষভাবে অস্বস্তিকর। সত্য হল, বাঙালি জাতীয়তাবাদী তৎপরতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্ব যেমন আবদুল হাই রচনাবলি ধারণ করে আছে, ঠিক তেমনি তাঁর রচনাগুলো সার্বিকভাবে পাকিস্তানবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরও নির্ভরযোগ্য প্রমাণপত্র বহন করছে, যেগুলোকে কেবল 'মুসলমান' বর্গে সীমিত করা যায় না।

'পূর্ব পাকিস্তানের তামদ্দনিক সংগঠন' প্রবন্ধে (*ভাষা ও সাহিত্য* গ্রন্থভুক্ত; ১৯৬০) তিনি লিখেছেন (১৯৯৪/৩ : ৮৭) :

> মুসলমানের সবচেয়ে বড় পরিচয়ই হলো তার মুসলমানত্বের পরিচয়। ইসলামে বিশ্বাস যদি তার দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, সকল পার্থিব ও অপার্থিব শক্তির আধার রূপেই যদি সে আল্লার ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে এবং নৈতিক ভিত্তির ওপরে যদি তার জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়, তা'হলে তার ব্যক্তিগত আচার-আচরণ, বিবাহাদি সকল ক্রিয়াকর্মে এবং ধর্মকর্ম প্রভৃতি সামাজিক জীবনধারায় তার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অন্য সব জায়গার মতো এ প্রবন্ধেও আবদুল হাই হিন্দু-মুসলমান মিলমিশ কম হওয়ার জন্য যেখানেই মুসলমানদের দুষেছেন, সেখানেই হিন্দুদের অকারণ স্বাতন্ত্র্যবাদিতার কথাও বলেছেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের চাপ বা অন্য যে কারণেই হোক, তাঁর লেখার এটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এখানে আরো আগ বাড়িয়ে তিনি বরং ভারতীয় মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যচেতনার পক্ষে বড় সাফাই গেয়েছেন। বলেছেন, সংখ্যালঘু বিধায় মুসলমানরা যদি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে না চলত, তাহলে তাদের পরিণতি শক, হুন বা গ্রিকদের মতো হতো।

বোঝাই যাচ্ছে, এসব মতকে ঠিক ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের জায়গা থেকে দেখা সম্ভব নয়। এগুলোই আসলে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান তাত্ত্বিক-মতাদর্শিক ভিত্তি।

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ) [প্রথম সংস্করণ ১৯৫৬; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৪] মুহম্মদ আবদুল হাই লিখেছিলেন 'কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা দফতরের পরিকল্পনা অনুযায়ী'। হুমায়ুন আজাদ অনুমান করেছেন (১৯৯৪/২ : পাঁচ-ছয়), তাঁর উপর ভার না পড়লে তিনি হয়ত এ বই লিখতেন না। এ অনুমান সত্য হতেও পারে। কিন্তু তিনি যা লিখেছেন, তাতে তাঁর অবস্থানগত বা মতাদর্শিক বিরাগ ছিল, এরকম কোনো ইশারা কোথাও পাওয়া যায় না। সেরকম হলে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ব্যাপারে এবং নতুন সংস্করণে আগের অসম্পূর্ণ কাজকে তুলনামূলক বেশি পূর্ণতা দেয়ার ব্যাপারে তিনি এত উদগ্রীব হতেন না (১৯৯৪/২ : ৪-৫)। হুমায়ুন আজাদ 'পাকিস্তানবিশ্বাসী' ও 'পাকিস্তানবাদী' বলে দুটি বর্গ তৈরি করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মুহম্মদ আবদুল হাই পাকিস্তানবিশ্বাসী হলেও পাকিস্তানবাদী ছিলেন না। ফলে তিনি 'বাঙলা সাহিত্যের পাকিস্তানি ইতিহাস না লিখে লেখেন প্রধানত মুসলমান লেখকদের ইতিহাস।' এই বর্গীকরণ ও বিবৃতি মোটেই যুক্তিসহ নয়; কারণ, মুসলমান পরিচয়কে উচ্চকিত করা ছাড়া পাকিস্তানবাদের অন্য কোনো ধর্মতাত্ত্বিক বা বিশ্বাসগত ভিত্তি ছিল না। পরবর্তীকালে পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট শাসকশ্রেণি ধর্মকে যেভাবে রাষ্ট্রীয় ভিত্তির মূল হিসাবে প্রচার করেছিল, তা সারা দুনিয়ার এবং এমনকি স্বাধীনতা-পরবর্তী

বাংলাদেশেরও 'ইডিওলজিকেল স্টেট অ্যাপারেটাস' মাত্র, প্রচারমূল্যের চেয়ে খুব বেশি মূল্যবান কোনো বিবেচ্য নয়।

বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা মোতাবেক মুহম্মদ আবদুল হাই এবং তাঁর সহ-লেখক সৈয়দ আলী আহসান মুখ্যত মুসলমান লেখকদের পরিচয়লিপিই প্রণয়ন করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের যুক্তিও খুব পরিষ্কার : বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে এ পরিচয় দুর্লভ। এই 'পাকিস্তানি' দাবি গভীরভাবে সত্য। তার মানেই হল, সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক চর্চার দিক থেকে বাংলা অঞ্চলে গভীরতর দ্বিজাতিতত্ত্ব আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। আর মুহম্মদ আবদুল হাই এবং তাঁর প্রজন্মের মানুষজন আসলে পাকিস্তান হওয়ার, এমনকি দ্বিজাতিতত্ত্বের দাবি পাকিস্তান দাবিতে রূপ নেয়ার বহু আগে থেকেই, এই বাস্তবতার মধ্যেই ছিলেন। নিছক 'পাকিস্তানবিশ্বাসী' আর 'পাকিস্তানবাদী' শব্দদ্বয়ের ফেরে সেই ইতিহাস ঢেকে ফেলার কোনো উপায় নাই। তার প্রধান কারণ, শুধু মুহম্মদ আবদুল হাই এবং তাঁর সহযাত্রীদের নয়, তাঁদের পরের প্রজন্মের সাহিত্যিকদের লেখার তালিকায় চোখ বোলালেই বোঝা যাবে, সাহিত্যিক দ্বিজাতিতত্ত্বের দাবির উপরই সেগুলো মুখ্যত প্রতিষ্ঠিত, আর সেই মায়া যে তাঁরা কাটিয়ে উঠেছেন ধীরে ধীরে, তার পেছনে অপরাষ্ট্র পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক ও নিপীড়ন-নির্ভর শাসন যতটা ভূমিকা রেখেছে, ভাবাদর্শিক অবস্থান তার ক্ষুদ্রাংশও রাখে নাই।

তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা বইয়ের ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে লেখা ভূমিকায় মুহম্মদ আবদুল হাই লিখেছেন (১৯৯৪/২ : ২০৩), 'এখানে সংকলিত পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থনে লেখা রচনাগুলোর মধ্যে 'ওরা ও আমরা' শীর্ষক রচনাটির জন্যে সেকালে কোন কোন সাহিত্যিক গোষ্ঠীর বিরাগভাজন হয়েছিলাম। একালের পাঠকদের অনেকেরই না জানার কথা, 'শনিবারের চিঠি'র স্বনামখ্যাত সম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাস রচনাটির জওয়াব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেছিলেন। ১৩৫৩ সালের চৈত্রমাসের 'শনিবারের চিঠি'তে সংবাদ সাহিত্যের পর্যালোচনায় বেতালভট্ট রচিত 'তোমরা ও আমরা' শীর্ষক নিবন্ধটি তার সাক্ষ্য বহন করছে।'

কী আছে পাকিস্তান আন্দোলনের তুঙ্গদশায় ১৯৪৬ সালে রচিত প্রবন্ধটিতে? আছে হিন্দু ও মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যের ঘোষণা। 'ওর আর আমার বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্য নিয়েই গড়ে উঠেছে আমাদের অতীত, তাই নিয়েই হবে আমাদের উভয়ের ভবিষ্যৎ।' পার্থক্য রেখেই মিলন কামনার মধ্য দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ হয়েছে (মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৯৪/২ : ২১২)। কিন্তু আগে যে ভাষায় মুসলমানের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন তিনি, যে ভঙ্গিতে ভারতের

এক হাজার বছরের ইতিহাস প্রণয়ন করেছেন, তাকে 'সাম্প্রদায়িকতা' নামে ডাকাও হয়ত অসম্ভব নয়।

প্রশ্ন হল, 'ওরা ও আমরা' নামের পাকিস্তান আন্দোলনের তুঙ্গ মুহূর্তে রচিত লেখাটিকে আমরা কি আবদুল হাইয়ের অবস্থান পাঠের জন্য মূল্য দেব? না দিয়ে উপায় নাই। কারণ, বই হিসাবে লেখাটি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে। ওই তারিখ দিয়েই তিনি ভূমিকা লিখেছেন। এ বইয়ে লেখাটি সংকলনের পক্ষে সাফাই হিসাবে বলা যেত, নিজের চিন্তার ধারাবাহিকতার লক্ষণ হিসাবে তিনি এটি সংকলন করেছেন। তা তো নয়। ভূমিকায় যেভাবে সাড়ম্বরে ওই পুরনো বিতর্কের উল্লেখ করেছেন, তাতে পরিষ্কার বোঝা যায়, ওই অবস্থান তিনি যে তখনো লালন করতেন কেবল তাই নয়, এর জন্য রীতিমতো গর্বও অনুভব করতেন।

পরবর্তীকালের বাঙালি জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্সে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের যে উপাদানগুলোকে 'পাকিস্তানবাদী' বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, তার কেবল একটির সাথে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুস্পষ্ট ভিন্নমত ছিল। পূর্ব বাংলার 'মান বাংলা' প্রশ্নে তিনি পূর্বতন কলকাতাকেন্দ্রিক মানভাষাটির পক্ষে শেষ পর্যন্ত কলমযুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। আমাদের জাতীয়তাবাদী বয়ানে এই অবস্থানের, অর্থাৎ কলকাতায় বিকশিত মানভাষার পক্ষের অবস্থানের নিরঙ্কুশ সমর্থন আছে। স্বভাবতই মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের এ অবস্থানও প্রশংসিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী অবস্থানের সারল্যের কারণে ওই ভাষাবিতর্কে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত মোহাজের আর পূর্ব বাংলার বাঙাল – এ দুই বর্গের সাংস্কৃতিক রাজনীতি খতিয়ে দেখা হয়নি। মুহম্মদ আবদুল হাই জন্ম ও কর্মসূত্রে 'প্রমিতভাষী' ছিলেন, আর তাঁর ভাষাকেন্দ্রিক অবস্থানে ওই বাস্তবতা বড় ভূমিকা রাখার কথা। যদি এ ব্যাপারগুলোকে আমলে না এনে এই সরল চালু বয়ানে আস্থা রাখি যে, কলকাতাকেন্দ্রিক প্রমিতপন্থিরা 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী', আর এর কোনো প্রকার পরিবর্তনপ্রস্তাবকারীরা 'পাকিস্তানবাদী', তাহলেও আমরা দেখব, মুহম্মদ আবদুল হাই ভাষারূপ প্রশ্নে যতটা 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী', সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রশ্নে ঠিক ততটাই 'পাকিস্তানবাদী'।

উদাহরণ হিসাবে 'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে ভাষার অনুশীলন' প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়। আভ্যন্তর-সাক্ষ্য মোতাবেক প্রবন্ধটি ১৯৫৯-৬০ সালের লেখা। সংকলিত হয়েছে *ভাষা ও সাহিত্য* গ্রন্থে। এই প্রবন্ধে সহজ বাংলা বা আরবি-ফারসিবহুল বাংলা চালুর প্রস্তাবের বিপরীতে মুহম্মদ আবদুল হাই স্পষ্টতই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে বিকশিত মান বাংলাকে গ্রহণ করার পক্ষে লিখেছেন। কিন্তু সেই সাথে সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পাওয়া যায় এরকম মত :

ক) পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের জীবনের প্রতিক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছিল। অখণ্ড ভারতে মুসলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ন রেখে স্বতন্ত্র জীবনধারা রচনা করা সম্ভব হতো না। (১৯৯৪/৩ : ২৩)

খ) বাঙালী মুসলমানের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নিত্যব্যবহার্য অগণিত শব্দ মুসলমান রচিত সাহিত্যেও অপাংক্তেয় রয়ে গেছে। নিঃসঙ্কোচে সেগুলোকে তাঁরা তাঁদের সাহিত্যে স্থান দিতে পারেন নি, নির্ভয়ে গ্রহণও করতে পারেন নি। ফলে রাজনৈতিক কারণে মুসলমানেরা যেমন পাকিস্তানের দাবি তুলতে বাধ্য হয়েছেন, সাংস্কৃতিক কারণে সাহিত্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করেছেন, সেই সাহিত্যের নিঃসঙ্কোচ প্রকাশের বাহন হিসেবে তেমনি তাঁদের জাতীয় ভাষার অবাধ ব্যবহারের দাবীও তাঁরা না তুলে পারেন নি। (১৯৯৪/৩ : ২৪)

এ উদ্ধৃতিগুলো পরিষ্কার সাক্ষ্য দেয়, মান-বাংলার পক্ষপাতজনিত 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' আর সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যজনিত 'পাকিস্তানবাদ' একসাথে অবস্থান করতে পারে। তাছাড়া এ প্রবন্ধে একদিকে তিনি রবীন্দ্রনাথের *চৈতালী* কাব্যস্থিত 'কুমারসম্ভবগান' কবিতা থেকে এবং নজরুলের *অগ্নি-বীণা* কাব্যস্থিত 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, এ ধরনের কিছু কিছু ভাষাভঙ্গি সম্ভবত মুসলমানের মুখে 'বেখাপ্পা শোনায়' (১৯৯৪/৩ : ২৮)। অন্যদিকে, নজরুলের 'মোহররম' এবং ফররুখের 'নিশান' কবিতা থেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, আরবি-ফারসি শব্দবহুল এ কবিতাগুলো উৎকৃষ্ট কাব্যকুশলতার নমুনা (১৯৯৪/৩ : ৩১-৩৩)। এমনকি ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজুল্লাহ্‌র *জুলেখার মন* কাব্য থেকে একটি কবিতার দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করে তার মধ্যে পুঁথি থেকে সংকলিত অচলিত শব্দে তিনি আবিষ্কার করেছেন 'আমাদের সাহিত্যের সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ' (১৯৯৪/৩ : ৩৫-৩৬)। ১৯৬০ সালে ঢাকার পাকিস্তানপন্থিরা এরচেয়ে বেশি কিছু চাইত কি?

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের রচনা থেকে ভাষা ও সাহিত্য প্রশ্নে তাঁকে 'পাকিস্তানবাদ-বিরোধী' আর 'বাঙালিপন্থি' হিসাবে দেখানোর জন্য ভাষ্যকারেরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন যেসব রচনা, তার মধ্যে 'আমাদের ভাষা ও সাহিত্য' অন্যতম প্রধান (হুমায়ুন ১৯৯৪/১ : তেরো-পনেরো)। এ নির্বাচন যথার্থ। ১৯৪৯ সালে অর্থাৎ পাকিস্তান হওয়ার অল্প পরেই এ রচনায় তিনি ভাষার 'ইসলামিকরণ'কে তীক্ষ্ণ-তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। বাংলা ভাষার ব্যাপারে অনুৎসাহী বাঙালিদের ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে নাকাল করেছেন। কিন্তু পুরো কাজটা তিনি করেছেন, তাঁর ভাষায়, 'চরমপন্থী' বা 'উগ্রপন্থী'দের বিরুদ্ধে। তাহলে তাঁর নিজের অবস্থান কী? প্রবন্ধের শুরুর পৃষ্ঠাতেই 'শত্রুপক্ষ' চিহ্নিত করার পাশাপাশি তিনি 'নিজপক্ষ'ও চিহ্নিত করেছেন। নিজেকে রেখেছেন 'নরমপন্থী'র কাতারে (১৯৯৪/১ : ৪৮৮)। তার মানেই হল, এটা একই মতবাদীদের নিজেদের মত ও পথগত বিবাদ – মোটেই পক্ষত্যাগের মতো কোনো

ঘটনা নয়। আমাদের ভাষ্যকারেরা যে এ তথ্য এড়িয়ে গেছেন, তাকে কি 'পরিকল্পিত ভুলপাঠ' বলা যায়?

৮

বাংলাদেশের ভদ্রলোক বুদ্ধিজীবীসমাজ ষাটের দশকের বয়ানে বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার সাথে পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর যে জল-অচল বিভেদ প্রচার করে, তার কোনো তথ্যগত সমর্থন পাওয়া যায় না। বস্তুত, পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামো আর সরকারকে ব্যভিচারী সাব্যস্ত করে এর সাথে কাঠামোগত দূরত্ব রক্ষা করেছিলেন কড়া 'পাকিস্তানবাদী' কবি ফররুখ আহমদ। ফররুখ আহমদ পাকিস্তান রাষ্ট্রে পুরস্কৃত হয়েছেন, আবার আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের প্রস্তাব মুখের উপর প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; চল্লিশের দশকের জরুরি সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক তৎপরতা হিসাবে গৃহীত 'মুসলমানি বাংলা'র কাব্যিক রূপায়ণ গোঁয়ার সংস্কারগ্রস্তের মতো চালিয়ে গেছেন ষাটের দশকেও, আবার জীবনে একবারের জন্যও পশ্চিম পাকিস্তানে পা রাখেননি। যত সরলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, ব্যাপারগুলো মোটেই সেরকম সাধাসিধা নয়। কোনো কালে কোনো ক্ষেত্রেই তা হয় না। ফররুখের মতো এরকম রাষ্ট্রের মিঠাইমি-া ভোগ না-করা উদাহরণ নিশ্চয়ই আরো পাওয়া যাবে। আর তাদের ভাবাদর্শিক-রাজনৈতিক অবস্থানও একরকম হওয়ার কোনো কারণ নাই। কিন্তু সে সময়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ লেখক-বুদ্ধিজীবী-অধ্যাপক ও সংস্কৃতিকর্মী-যে রাষ্ট্রীয় কাঠামোগত সুবিধাদির সাথে প্রত্যক্ষত সম্পর্কিত থেকেই কাজ করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। এটাই স্বাভাবিক। একদিকে তখনো রাষ্ট্রটি ছিল পাকিস্তান, অন্যদিকে সে কালে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে সামাজিক সমর্থনের পরিসরটিও অনেক ছোট ছিল। তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সাধিত সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, লেখক সংঘ, সরকারি টাকায় গবেষণা বা অন্য লেখার প্রকল্প, পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধকালীন প্রচারণায় শরিক হওয়া, জীবনীর অনুবাদ ও সম্পাদনা, দেশ-বিদেশে ভ্রমণ, সরকারি পত্রিকায় লেখালেখি ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের পরিমাণ নিশ্চয়ই অনেকের ক্ষেত্রে অনেক কম হতে পারত। এ ধরনের কিছু সাধারণভাবে ঘটেনি বলেই কি পরবর্তীকালে আমাদের প্রভাবশালী ডিসকোর্সে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মতাদর্শিক ভিত্তি বা রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের সাথে অধিকতর বিচ্ছিন্নতা প্রমাণের প্রয়োজন হয়েছিল?

সাধারণভাবে যে কোনো জনগোষ্ঠীর শ্রেণিগত ও মতাদর্শিক ঐক্য থাকলেও নানা ব্যাপারে মতের ভিন্নতা থাকতে পারে। মানুষের মধ্যে প্রভাবশালী চিন্তারও অনেক ধারা থাকে। এই ভিন্নতা দিয়েই পাকিস্তান আমলের মতভিন্নতার অনেকগুলোকে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু এও মনে রাখা জরুরি, পাকিস্তান কেবল একটি সামরিক-শাসনের প্রাধান্য-

কবলিত অপরাষ্ট্রই ছিল না, এটা ছিল বিশ্রীরকমের কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র, যার মূলনীতি প্রান্তগুলোকে এবং এমনকি কেন্দ্র-বহির্ভূত প্রদেশগুলোকেও দমিয়ে রেখেছিল। তার মধ্যে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ। একদিকে জনসংখ্যার বড় অংশ এখানকার অধিবাসী হওয়ায়, আর ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে ভিন্ন হওয়ায় একটা ঘোরতর সন্দেহ ছিল। তার উপর ভারতবেষ্টিত অঞ্চলটিকে 'শত্রুরাষ্ট্রে'র ঘনিষ্ঠতার অপবাদ দেয়া খুব সহজ হয়েছে। আর জাতিবিদ্বেষ তো ছিলই। জাতিবিদ্বেষ ছাড়া কেবল রাজনৈতিক কারণে ২৫ মার্চে শুরু হওয়া ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ ও নির্মূল অভিযান সম্ভব ছিল না। তার মানে আবার এ নয়, ২৫ মার্চের হত্যাযজ্ঞ, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তিকে কালাতিক্রমীভাবে ব্যবহার করে আগের সমস্ত ইতিহাসকে সরল বাইনারিতে সাজাতে হবে। ফেরেশতা ও শয়তানের দ্বন্দ্বে পক্ষ-বিপক্ষ আকারে দুই পক্ষকে আঁটিয়ে ফেলার যে শিশুতোষ চর্চা, তা মিথ ও ধর্মকাহিনির বৈশিষ্ট্য – ইতিহাসের নয়। গত পাঁচ দশক ধরে প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসচর্চার এই ধরন আমাদের জনগোষ্ঠীকে বয়ঃসন্ধিকালীন আবেগে থিতু রেখেছে, পূর্ণমনস্ক বা সাবালক ইতিহাসের পথে অগ্রসর করেনি।

মুহম্মদ আবদুল হাই-চর্চার ক্ষেত্রেও এ প্রবণতার প্রাধান্য দেখা গেছে। জাতীয়তাবাদী বয়ানের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আঁটিয়ে ফেলার জন্য তাঁর রচনার সেনসরড্ ভাষ্য তৈরি করা হয়েছে, এবং এমনসব বিষয়ে জোরারোপ করা হয়েছে যেগুলো তাঁর রচনার তথ্য-উপাত্তের সাথে খাপ খায় না। ইতিহাসপ্রণয়ন তো নয়ই, এটা শ্রদ্ধা প্রদর্শনেরও ভালো পদ্ধতি নয়। যদি এমন হত, জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণার বিকাশের সাথে সাথে তাঁর লেখার বিষয় আর ঝোঁকে গুরুতর বদল ঘটেছিল, যেমন ঘটেছিল সাহিত্যিক-চিন্তক আবদুল হকের ক্ষেত্রে, তাহলেও এ পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হত। কিন্তু তা তো নয়। সাধারণভাবে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ক্ষেত্রে দেখি, সাতচল্লিশের কাছাকাছি সময়ে তিনি কথিত 'পাকিস্তানপন্থি' রচনাদির সাথে সাথেই লিখছেন সংস্কৃত রসতত্ত্বের সুন্দর বয়ান; সৌন্দর্যতত্ত্বের ভাষ্য তৈরি করছেন রবীন্দ্রকাব্যের প্রশ্রয়ে। তার মানে, এ দুটি তাঁর কাছে পরস্পরবিরোধী কোনো ব্যাপার ছিল না। পাকিস্তান দাবি এবং কলকাতার ভাষা ও সাহিত্যে অবগাহন তাঁর মধ্যে কোনো বিরোধ তৈয়ার করে নাই। অন্যদিকে আবার, যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, ১৯৪৯ সালে রচিত 'আমাদের ভাষা ও সাহিত্য' নামের তীব্র রচনায় তিনি ঢাকার মানভাষা সম্পর্কে ঠিক সেই অবস্থান জানিয়ে দেন, যে অবস্থানের পক্ষে আমৃত্যু তিনি ব্যাপকভাবে লড়বেন, এবং একই রচনায় সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক তাঁর ওই মতও জোরালোভাবে প্রকাশ পায়, যাকে পরবর্তীকালে 'পাকিস্তানবাদী' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের মূল্যায়নমূলক রচনাগুলোর একটা বড় অংশের স্বরগত ঐকতানের ভিত্তিতে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রভাবশালী ডিসকোর্সে এভাবে দেখাটাই রেওয়াজ। আর আবদুল হাই রচনাবলির পাঠ আমাদের আশ্বস্ত করে, যতটা বা যে অর্থে বলা হয়, ব্যাপারগুলো মোটেই সেরকম পরস্পরবিরোধী নয়।

উল্লেখপঞ্জি

আজহারউদ্দীন খান ২০০০, 'ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ আবদুল হাই', *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারকগ্রন্থ*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

আবুল কাশেম চৌধুরী ২০০০, 'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি : মুহম্মদ আবদুল হাই', *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারকগ্রন্থ*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

নীলিমা ইব্রাহীম ২০০০, 'শ্রদ্ধাঞ্জলি', *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারকগ্রন্থ*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

মনসুর মুসা ২০০০, 'ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ আবদুল হাই', *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারকগ্রন্থ*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

মনিরুজ্জামান ২০০০, 'অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই : তাঁকে শ্রদ্ধা', *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারকগ্রন্থ*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৯৪/১, *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী ১ম খণ্ড*, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৯৪/২, *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী ২য় খণ্ড*, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৯৪/৩, *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী ৩য় খণ্ড*, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুহম্মদ এনামুল হক ২০০০, 'অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই', *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারকগ্রন্থ*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

মোহাম্মদ আজম ২০০৬, 'হুমায়ুন কবিরের *বাংলার কাব্য* : ছয় দশক পর', *মাওরুম*, দীপায়ন খীসা সম্পাদিত, ঢাকা

মোহাম্মদ আবু জাফর ২০০০, 'অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই', *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারকগ্রন্থ*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ২০০০, 'মুহম্মদ আবদুল হাই : জীবন ও সাধনা', *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারকগ্রন্থ*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, *বাংলা শব্দতত্ত্ব*, তৃতীয় স্বতন্ত্র সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিতান, কলকাতা

সাঈদ-উর রহমান ২০০০, 'সাহিত্য সমালোচক মুহম্মদ আবদুল হাই', *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারকগ্রন্থ*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় ২০০০, 'প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই', *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারকগ্রন্থ*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৪, 'অবতরণিকা', *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী* ১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

Chatterji, Suniti Kumar 1993, *The Origin and Development of the Bengali Language*, Rupa & Co, New Delhi